নিজের দেশকে চিনুন— নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

শ্যামল চক্রবর্তী

প্রত্যেকটি দেশকেই নিজের দেশের পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটাতে হয়। নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষাই তাই। নিজের দেশের উপযোগী করে মার্কসবাদ প্রয়োগ করে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেনিন। চিন, ভিয়েতনাম, কিউবাসহ সব দেশেই নিজের দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবের বিকাশ ঘটিয়েছে।

আমাদের দেশেও বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবী আন্দোলনের বিন্যাস করতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মূল কথা হলো নিজের দেশকে চেনো। নিজের দেশকে চেনা মানে— আমাদের দেশের সমাজটা কেমন ছিল এবং কেমন আছে, কিভাবে সমাজের পরিবর্তন হচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক পরিস্থিতির অবস্থা কেমন তার চুলচেরা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা দরকার। শুধু ব্যাখ্যা করলেই হবে না, মার্কস বলেছিলেন যে, মানুষকে নিজেদেরই এটা পরিবর্তন করতে হবে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অগ্রগতি হবে সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়া। অতীতে ফিরে যাওয়া নয়। এ বিষয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস দু'জনই যথেষ্ট আলোকপাত করেছিলেন। সেই আলোকিত পথ ধরেই মার্কসবাদীরা ভারতের মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারবে। মার্কসই প্রথম অর্থনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক, যিনি এই কাজে পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করেছেন। মার্কস প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন, জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রায় ৭/ ৮ বছর কাজ করতে হয়েছিল। লেখক হিসাবে তাঁর কাজ ছিল আমেরিকার বাইরের দেশগুলো সম্পর্কে লেখা। এই সময় তিনি ভারত সম্পর্কেও লেখেন। কিন্তু ভারত সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মার্কসের একটা সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়েছিল— সেটা এখন স্পষ্ট হয়েছে। যেহেতু তিনি ভারত সম্পর্কে কোনও ভারতীয় ঐতিহাসিকের লেখা পাননি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের লেখা পড়ে তার ধারণা হয়েছিল ভারতীয়দের ইতিহাস বোধের ঘাটতি আছে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদেরও ঘাটতি ছিল। তারা সংস্কৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা লেখা ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছিলেন। কার্যত সেই ইতিহাসগুলি ছিল একতরফা — সমাজের উচ্চশ্রেণির দৃষ্টিতে লেখা। মার্কস- হেগেলের লেখা PHILOSOPHY OF HISTORY বইটির উপরে নির্ভর করেছিলেন। মার্কসের মৃত্যুর প্রায় ১৩ বছর পর মার্কসের মেয়ে নিউইয়র্ক টাইমসের লেখাগুলিকে নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেন, এর মধ্যে এঙ্গেলসেরও পাঁচটি প্রবন্ধ ছিল যা মার্কসের নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে ভারতের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা মার্কসের লেখা নিয়ে আলোচনা করছেন এবং মত জানাচ্ছেন। শুধুমাত্র NEW YORK TRIBUNE -এ লেখা দেখে মার্কসের ভারত সম্পর্কে আলোচনা সঠিক নয়। কারণ, মার্কস আমৃত্যু ভারত সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছেন এবং ক্রমাগত নিজের লেখা সংশোধন করে গেছেন। ব্যাখ্যামূলক যে টিকাগুলি লিখেছিলেন তা Grundises নামে খ্যাত। সেখানে তাঁর খসড়া লেখাতে প্রাক্ পুঁজিবাদী নকশায় ভারতের কথা ছিল। ক্যাপিটালের এই খণ্ডে ভারতের বিষয়ে আংশিক নবমূল্যায়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ভারত নিয়ে মন্তব্য আছে যা আগেকার মত থেকে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

মার্কস দেখিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ শাসন ভারতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছে যা আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি তৈরি করবে এবং ভারতে একটা বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত করার আবহাওয়া তৈরি করতে পারে।

এই বিষয়ে তিনি রেলগাড়ি এবং রেললাইন তৈরি করে রেলগাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করার উদাহরণ দিয়েছেন। ১৮৫৩ সাল থেকে ভারতে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয় এবং প্রায় ১০০ বছরে ব্রিটিশরা ৫৪ হাজার কিলোমিটার (প্রায়) রেললাইন তৈরি করেছিল। স্বাধীন হওয়ার পরবর্তী ৭০ বছরে নতুন রেল যোগাযোগ ও রেলপথ স্থাপনে খুব একটা সাফল্য আসেনি।

ইংরেজ মিল মালিকরা রেল ব্যবস্থা করেছিল নিজেদের শিল্প- বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। তৎকালীন সময়ে বস্ত্র শিল্পের জন্য তুলা এবং অন্যান্য কাঁচামাল, বিশেষ করে কৃষিজাত, খনিজাত কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, ধাতু ইত্যাদি কম ব্যয়ে নিয়ে আসতে পারে। এটা তাদের নিজেদের স্বার্থেই করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটি কাজও হয়ে গেল যাকে ইংরেজিতে বলা হয় বাইপ্রোডাক্ট তা হলো ভারতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা ও লোহা পাওয়া যায়। এ দুটোই হলো শিল্পের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। রেলের জন্য দরকার হয়েছিল একটা সুশিক্ষিত কারিগর বাহিনি। রেল চলাচলের ব্যবস্থা সচল রাখতে শুধুমাত্র আমদানি ব্যবসার উপর নির্ভর করলে তো হবে না। এখানেই কিছু শিল্প তৈরি করতে হবে, তা হয়েছিল, শুধু তাই না এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদকে ব্যবহার করে, এখানেই অনেক শিল্প, কলকারখানা তৈরি হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যন্ত্রের ব্যবহার একবার চালু হয়ে গেলে এবং কাঁচামালের জোগান দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অব্যাহত থাকলে, সেখানেও রেলের কাজে লাগবে না। কিন্তু অন্য প্রয়োজনে লাগবে এবং মুনাফাও পাওয়া যাবে, অনেক ধরনের শিল্প হবে। পণ্য উৎপাদনের জন্য উপযোগী এমন কলকারখানা তৈরি হবে।

যে যে এলাকার উপর দিয়ে রেলপথ যাবে সেই গ্রামগুলিতে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরি জ্ঞান অর্জন করা এবং তার কৃৎকৌশল আয়ত্ত করবার ফলে সামাজিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি অগ্রগতির পথের সূচনা হবে।

ভারতে আছে বংশানুক্রমে জাতপাত ব্যবস্থা, এই ধরনের অসভ্য বর্বর প্রথা একমাত্র ভারতেই আছে। আর জাতপাতের সৃষ্টি কাজের ভিত্তিতে। প্রত্যেকটি দেশেই কাজের একটা স্বাভাবিক বিভাগ থাকে; কিন্তু এমন নয় কাজের বিভাগটা স্থায়ী। আজ যিনি কাঠের কাজ করেন, আগামীকাল তিনি চামড়ার কাজও করতে পারেন, আবার তার পরের দিন গির্জারও পাদ্রী হতে পারেন। তাদের কাজ পরিবর্তনের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু ভারতে আছে অন্য ব্যবস্থা— তার বাপ- ঠাকুরদা যে কাজ করতেন বাধ্যতামূলকভাবে তাকেও সেই কাজ করতে হবে এবং যে কাজ করেন সেই কাজ অনুযায়ী, সমাজে তার অবস্থান নির্দিষ্ট হবে— তাকে সেটা মেনে নিতে হবে। এটা ঠিক করবেন অল্প সংখ্যক কিছু লোক যারা বংশ পরম্পরায় সমাজের সমাজপতি, তথাকথিত উচ্চবর্ণের বংশধর, তারা উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট, চোর- ডাকাত, যাই হোক না কেন, তিনি বংশ পরম্পরায় সমাজের উচ্চবর্ণেই অধিষ্ঠিত থাকবেন। উচ্চবর্ণ বাদে অন্য সমস্ত মানুষকে অপাঙক্তেয় করে রাখা হবে অর্থাৎ তারা এক পঙক্তিতে বসে খেতে পারবেন না। কেউ কেউ আবার অস্পৃশ্য হয়ে থাকবেন, এমন কি তাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ হবে।

বংশানুক্রমে যে এই কাজ করতে বাধ্য হয়, তার দর কষাকষির ক্ষমতা কমে যায় এবং সে বেঁচে থাকার জন্য অল্প মজুরিতেও কাজ করতে বাধ্য হয়। শ্রেণি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার এ এক অপূর্ব রণকৌশল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বিকৃত মানসিকতার লালন-পালন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের একটি নির্লজ্জ এবং অমানবিকতার উদাহরণ।

কিন্তু রেললাইন বসানো ও শিল্প স্থাপনের ফলে সুবিধা হবে কোনও' নির্দিষ্ট জাতবদ্ধ' মানুষ, সে কোনও কারিগরি কাজে সুযোগ পাবে এবং নিজেকে বিকশিত করতে পারবে।

মার্কস বলেছিলেন— " ভারতে একের পর এক, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনস্রোত এসেছে— শক, হূন, আরবি, পাঠান, মোগল, তুর্কি এবং তাতার। তারা ভারতে থেকে পুরোদস্তর ভারতীয় হয়ে গেছে। তার কারণ ভারতের তৎকালীন সভ্যতাগুলো আক্রমণকারীদের থেকে সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল।"

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ করা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে, তিনি লিখেছিলেন যে—

" ভেদী মরুপথ গিরি পর্বত যারা এসেছিল সবে
তার মোর মাঝে সদাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর
আমারই শোণিতে রয়েছে, ধ্বনিতে তারই বিচিত্র সুর।।"

তিনি আরও লিখেছেন—

" হেথায় আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবিড় চীন।
শক হূনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

দুটোই আসলে একই কথা, দুটো কথা বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন দুই মনীষী। একটা ক্ষেত্রে মার্কস উল্লেখ করতে পারেননি যেটা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তা হলো, " আর্য , অনার্য" এই শব্দ দুটো।

ভারতের আদিম সভ্যতা— হরপ্পা মহেঞ্জোদারো সভ্যতার কথা মার্কসের জানা ছিল না। এটা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল মার্কসের মৃত্যুর ৪ দশক পর ১৯২১সালে (এর প্রায় আড়াই দশক আগে এঙ্গেলসও মারা গিয়েছিলেন)। কারণ, নবাগত আর্যরাও হরপ্পা সভ্যতার সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছে পরে তা মিশ্রিত সভ্যতা হয়ে যায়।

আর্য সভ্যতার তুলনায় অনার্য সভ্যতা ছিল উন্নত। কিন্তু ইংরেজরা যখন আসে, তখন ভারতের তুলনায় পাশ্চাত্যে অনেক উন্নত সভ্যতা ছিল।

কিন্তু ইউরোপীয়রা ভারত, চিন বা আরব দেশের চেয়ে উন্নততর সভ্যতা হয় ইউরোপে রেনেসাঁস শুরু হওয়ার পর। খ্রিস্ট জন্মের পর প্রথম কয়েক শতাব্দী ভারতীয় সভ্যতা ছিল অনেক উন্নত। এই সময়ে ভারতে অনেক সৃষ্টিশীলতার প্রসার ঘটে। তারপরে বিকাশ ঘটে আরবীয় সভ্যতার ও চিন সভ্যতার। এরা সবই ইউরোপীয় সভ্যতার থেকে উন্নত ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতন, রেনেসাঁস এবং শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পে অনেকখানি এগিয়ে যায়।

ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ তার একটি লেখায় লিখেছিলেন যে— ভারত ইউরোপের থেকে এগিয়েছিল কিন্তু ভাববাদী দার্শনিক শংকরাচার্যের নেতৃত্বে ভাববাদী দর্শনের একাধিপত্যের ফলে জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা বন্ধ হয়ে যায়, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই আওয়াজ তুলে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি আটকে দেওয়া হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসকরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল কি হতে পারে এ সম্পর্কে মার্কস অসাধারণ বিশ্লেষণী প্রতিভা দিয়ে দেখিয়েছিলেন, দেশীয় যে সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশ ড্রিল সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্মমুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনও আক্রমণকারীর মোকাবিলা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম পরিচালনায় স্বাধীন সংবাদপত্র পুনর্নির্মাণের এক অভিনব ও শক্তিশালী মাধ্যম, তা মানুষের চেতনা বৃদ্ধি ও জ্ঞানের পরিসর অনেক প্রসারিত করবে। তৃতীয়ত, জমিদারি ও রায়তওয়ারি যত ঘৃণ্যই হোক, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ— এশীয় সমাজের মহান লুপ্তসূত্র হলো এইটে।

চতুর্থত, কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছায় হলেও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নতুন একটি শ্রেণি গড়ে উঠেছিল, যারা সরকার পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হলো ভারতের উৎপাদনী শক্তি পঙ্গু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবহণ ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাব। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

মার্কস বলেছিলেন যে—" ব্রিটিশরা ভারতে একটা রাজনৈতিক ঐক্য তৈরি করতে পেরেছেন, এটা মোঘল আমলের থেকে অনেক বেশি সংহত ও সুদূরপ্রসারী।" ব্রিটিশরা কামান বন্দুক তৈরি করেছে, রেলপথ ও টেলিগ্রাফের সাহায্যে অনেক দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়েছে। তবে এরই প্রতিক্রিয়ায় — নানা জাতি, নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা পরিধানের এই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়ে গেছে। (এই মন্তব্যটি লেখকের নিজস্ব) মার্কস বলেছিলেন

যে—" ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে প্রচলিত গ্রাম্য অর্থনীতির অনেক অবলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন, ভারতীয়দের উপর থেকে পুরানো ঐতিহ্য ও কুসংস্কারের শিকল জড়ানো ছিল তা ব্রিটিশরা অনেকটা শিথিল করে দিয়েছিল, তা ভারতে একটা পুনর্জাগরণের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল।" মার্কস বলছিলেন, "ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক ফলাফল যেমন আছে তেমনই ইতিবাচক কৃতিত্বও আছে। যেমন, দেশীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে কার্যকরী প্রতিরক্ষা। স্বাধীন সংবাদপত্র নতুন চেতনা সঞ্চার করেছিল। রেল ও বাষ্পচালিত জাহাজ ভারতকে সমুদ্রপথে পাশ্চাত্য দুনিয়ার কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল ফলে সীমাবদ্ধভাবে হলেও পশ্চিমি শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। বুর্জোয়া শ্রেণির জন্মলাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। এর সবগুলোই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তিকে যেমন সংহত করেছিল, তেমনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।" ভারতীয় সমাজে সবচেয়ে অপমানিত, অবদমিত, বঞ্চিত, নিম্নতর শ্রেণি সম্পর্কে মার্কসের উচ্চ ধারণা ছিল, তাদের হাতে ভারতে শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বলে তিনি মনে করতেন।

মার্কস ক্যাম্পবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন— " নিম্নতর শ্রেণিটির দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা থেকেই তাদের শিক্ষিত করার কাজটি ভারতবর্ষে করা যাবে যেমনটি অন্য দেশে করা যায়নি।" ক্যাম্পবেলকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন " ভারতবর্ষের মহান জনগণের মধ্যে রয়েছে এক শিল্পোদ্যম, পুঁজি সংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী সংখ্যাতত্ত্ব এবং প্রমাণ নির্ভর বিজ্ঞানের প্রতিভা, মস্তিষ্কের প্রখর গাণিতিক স্বচ্ছতায় অসাধারণ তাদের বুদ্ধিমত্তা।" মার্কস মনে করতেন, "সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের শ্রমে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে এবং যন্ত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে" ভারতীয়দের সত্যিকারের কোনও অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

অতএব পুঁজিবাদী এবং শিল্প শ্রমিক হয়ে উঠার যোগ্যতা ভারতবাসীর ছিল। মার্কসের অভিমত ছিল, একবার যদি ভারতবর্ষে শিল্প সর্বহারা শ্রেণির উদ্ভব হয়, তবে সে শ্রেণি হবে বর্ণভেদ রহিত। ভারতবর্ষের প্রগতি এবং শক্তির নির্ণায়ক বিরোধী যে বংশানুক্রমিক শ্রম বিভাজন, যার আশ্রয়ে বেঁচে আছে ভারতবর্ষের বর্ণভেদ, সেই বিভাজনের অবলুপ্তি ঘটাবে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ফসল এবং আধুনিক শিল্প। মার্কস বলেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক উপাদানের বীজ বপন করেছিল। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের মানুষ কবে সে ফসল ঘরে তুলতে পারবে? তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, এই ফসল তুলতে পারার দুটি বিকল্প পথ আছে। যতদিন না গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যেই শিল্প সর্বহারারা নিজেরা শাসক হয়ে ওঠে অথবা ভারতীয়রা আপন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে একত্রে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব মন্তব্য করেছিলেন, আধুনিক ইতিহাসে যদি এমন একজন মানুষও থাকেন, যার কোনও বিশেষণ প্রয়োজন নেই, তিনি হলেন কার্ল মার্কস। তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র ঔপনিবেশিকতায় সংস্কার নয়, তার অবসানই ইউরোপীয় সমাজবাদী আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য। এ কথা ১৮৫৩ সালেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এমনকি ভারতবর্ষের মানুষ তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করবে তার ফলে অবশ্যই ইউরোপীয় শ্রমজীবী শ্রেণির বন্ধনমোচনের পথ প্রশস্ত করবে। ইরফান হাবিবের কথায়— " এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, এমন পরিজ্ঞান একমাত্র মার্কসের পক্ষেই সম্ভব।"

সমাজের বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের তত্ত্ব ছিল যে সমাজের বিকাশ হয়েছে ৪ পর্যায়ে। আদিম সমাজতন্ত্র, দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ। তিনি বলেছিলেন সব দেশে ৪টি পর্যায় হুবহু একইরকম নাও হতে পারে। একমাত্র আদিম সাম্যতন্ত্র ও পুঁজিবাদ হলো সর্বজনীন, এটা সব দেশেই হয়, ভারতেও হয়েছে। কিন্তু মার্কসের মতে ভারতে সামন্ততন্ত্র ছিল না, ছিল এশিয়াটিক সমাজ প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের একটি বহিঃ প্রকাশ। ভারতের মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে একমত নন, তাদের ব্যাখ্যা মার্কসকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের লেখার উপর ভিত্তি করে লিখতে হয়েছিল (কারণ আর কোনও বিকল্প ছিল না) তাই তার মন্তব্যে অস্পষ্টতা আছে। আর এস শর্মার মতে ভারতের সামন্ততন্ত্রকে বলা যায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্র (Semifeudalism)। এই প্রবন্ধের ছোটো পরিসরে সে আলোচনা সম্ভব নয়।